বাংলাদেশে পদার্থবিদ্যা চর্চা

হিরন্ময় সেন গুপ্ত*

গালিব আহসান খানের 'বিজ্ঞান, পদ্ধতি ও প্রগতি' বই–এর উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করছিঃ

> "বিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটেছিল কিন্তু অবৈজ্ঞানিকভাবে। এটা কূটভাষের মত শোনালেও এটাই ছিল স্বাভাবিক। কারণ, বিজ্ঞানকে আমরা পাই বিজ্ঞানের উদ্ভবের পর। আর তাই, বিজ্ঞানের উদ্ভব যখন ঘটে, ঠিক সে–সময়টায় বিজ্ঞান ছিল না, সুতরাং, বৈজ্ঞানিকভাবে বিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটার কোন উপায়ও ছিল না। সে–সময়টাতে আমরা যা পাই তা হলো বিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটার পক্ষে সহায়ক কিছু কর্মকান্ড, কিছু প্রক্রিয়া।"

বক্তব্যটিকে আরও স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন কয়েকটি সুন্দর উদাহরণের সাহায্যে। তাদের একটি হচ্ছে গ্রীক্ দার্শনিকদের পরমাণু সম্পর্কীয় ধারণা। গ্রীক–পরমানুবাদীগণ (পাঠক লক্ষ্য করুন, পরমাণুবিদ নন, কারণ প্রাক্ পরমাণু আবিষ্কারের কথা বলছি) বিশ্বাস করতেন যে, বিশ্বের সব কিছুরই মূল উপাদান হচ্ছে পরমাণু। পরমাণু সম্পর্কে তাঁরা যে ধারণা পোষণ করতেন, তা হচ্ছে, "এই পরমাণু হল অস্তিত্বশীল সত্তার অবিভাজ্য, অবিনশ্বর ও ক্ষুদ্রতম একক।· · পরমাণু গতিসম্পন্ন, এবং সেই গতি বিরামহীনভাবে প্রবহমান থাকবে।" পরবর্তীতে পরমাণু আবিষ্কার হয়। আবিষ্কারের পরে আমরা জানি, এ ধারণা আংশিক সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। আংশিক সত্য বলেই হয়ত ধারণাটি ভ্রান্তিপূর্ণ। অণু ও পরমাণুর পার্থক্য ঐ সময় থাকারও কথা নয়। পরমাণু, আমরা এখন জানি, অবিভাজ্য নয়, অবিনশ্বরও নয়। 'অস্তিত্বশীল সত্তা' কথাটির অর্থ বোঝার চেষ্টা করছিলাম। 'অস্তিত্ব' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'বিদ্যমানতা', 'স্থিতি', 'সত্তা'। আর 'সত্তা'–এর অর্থ (আভিধানিক) হচ্ছে 'অস্তিত্ব', ইত্যাদি। অনুরূপভাবে 'অস্তিত্ব'–এর ইংরেজি হচ্ছে *existence*', `*presence*', `*being*' ইত্যাদি, আর 'সত্তার' ইংরেজি `*existence*', `*presence*' `*entity*' ইত্যাদি। তাহ'লে কি দাঁড়াচ্ছে?

---

* *অধ্যাপক, পদার্থ বিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

ত্র্যম্বকের ত্রিনয়ন ত্রিকাল ত্রিগুণ
শক্তিভেদে ব্যক্তিভেদ দ্বিগুণ বিগুণ"
ইত্যাদি–

অর্থাৎ "সংক্ষেপে বলিতে গেলে–হিং টিং ছট।"

যাই হোক "পরমাণু গতিসম্পন্ন এবং সেই গতি বিরামহীনভাবে প্রবহমান থাকবে"–এগুলোও অজ্ঞানতা প্রসূত নিছক কল্পনা মাত্র। প্রাক্ বিজ্ঞানের যুগে এ ধরনের ভ্রান্ত ধারণা থাকাই স্বাভাবিক কারণ এ ধারণার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তখন ছিল না। পরীক্ষা–নিরীক্ষা দ্বারা লব্ধ জ্ঞানই বিশেষ জ্ঞান, অর্থাৎ বিজ্ঞান। তাই গালিব আহসান খান বলেছেন, বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছে অবৈজ্ঞানিকভাবে। ধীরে ধীরেই পদার্থবিদ্যা তথা সমগ্র বিজ্ঞানের ইমারত গড়ে উঠেছে। এ জ্ঞানের ভান্ডার এত সুবিশাল যে বিপরীত (আপাত) তত্ত্ব বা পদার্থ বিদ্যার আপাত বিরোধী তথ্য এবং তত্ত্ব এখানে সহ–অবস্থান করছে। তবুও ভাষার আভরণে ভাব ঢেকে থাকে না।

জ্ঞান অসীম, বিজ্ঞানও অসীম, বিজ্ঞানের শাখা পদার্থ বিদ্যা– তার নিজস্ব কলেবর – তাও অসীম। এযেন সেই 'পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণ মেবাবশিষ্য তে' (অর্থাৎ পূর্ণ থেকে পূর্ণ নিয়ে গেলেও পূর্ণ অবশিষ্ট থেকে যায়) কিংবা তার বিপরীত ধারা ঃ অসীম + অসীম + · · · = অসীম!

কখনও কখনও একথা বলা হয়ে থাকে যে, বিজ্ঞান হ'ল খন্ড জ্ঞান (বিজ্ঞানের শাখা সমূহ' ত' বটেই), আর দর্শন হচ্ছে সামগ্রিক জ্ঞান, তাই অখন্ড জ্ঞান। এর কারণ হিসেবে বলা হয় যে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগতের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলী পর্যালোচনা করে। যেমন পদার্থ বিদ্যার কথা বলা যায় যে, জড় বস্তুর প্রকৃতি ও ধর্ম নিয়ে আলোচনা করার দর্শন (বা বিজ্ঞান) হচ্ছে পদার্থ বিদ্যার বিষয়বস্তু। অপর পক্ষে, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য – ইন্দ্রিয়াতীত সব কিছুই দর্শনের পরিসরে।

পদার্থ বিজ্ঞানী এতে ক্ষুণ্ন হননা। তিনি জানেন পদার্থ বিদ্যার শুরু দার্শনিকদের হাতে। গ্রীক শব্দ Phusis/ Physis (প্রকৃতি) থেকে Physics এর উৎপত্তি। একে 'Natural Philosophy' নামেও অভিহিত করা হয়। তাই নিঃসন্দেহে দর্শনের একটা অংশ হচ্ছে পদার্থ বিদ্যা। কলেবরে বৃদ্ধি পেয়ে এটি জ্ঞান–বিজ্ঞানের অন্যান্য সকল শাখাকে ছাড়িয়ে গেছে।

বিজ্ঞান ও দর্শন সম্পর্কে বিদগ্ধ সমাজে জ্ঞাত নিম্নলিখিত বক্তব্যটি ওয়েবারের– "দর্শন ছাড়া বিজ্ঞানসমূহ হল ঐক্যহীন সমষ্টি মাত্র, আত্মাহীন দেহ। আর বিজ্ঞান ছাড়া দর্শন হচ্ছে দেহহীন আত্মামাত্র।" গোবিন্দ দেবের ভাষায়–"একদিন বিজ্ঞানকেই দর্শন বলে আখ্যা দেওয়া ছিল রেওয়াজ, আর আজ দর্শনকেই বিজ্ঞান বলে পরিচিত করার কত চেষ্টা।" তিনি আরও বলেছেন, "চুলচেরা বিচার–বিশ্লেষণ না করে সাধারণভাবে অবশ্য একথা বলা চলে যে, বিজ্ঞান ও দর্শন উভয়েরই লক্ষ্য জ্ঞান আহরণ। তাই জ্ঞান–পিপাসাই

দর্শনের ও বিজ্ঞানের যোগসূত্র, তাদের সাধারণ লক্ষণ। যে সুপ্রাচীন যুগে বিজ্ঞানের শৈশবের শুরু ও দর্শনের তারুণ্যের প্রথম পদক্ষেপ, সেদিন অনেকটা গোঁজামিল দিয়ে দর্শন ও বিজ্ঞানকে জ্ঞান আহরণের ভোজসভায় সমাসনে, এক পংক্তিতে বসিয়ে দেয়া সহজ ছিল, অন্ততঃ কঠিন ছিলন। কিন্তু বিজ্ঞানের এই দ্রুত অগ্রগতির যুগে তাকে দর্শনের এক পর্যায়ভুক্ত করার চেষ্টা যে আজ নিষ্ফল ও হাস্যকর, তা' বলাই বহুল্য।" জ্ঞানের প্রতিটি শাখারই গতি থাকে, থাকে স্রোতপ্রবাহ, কখনও কখনও গতি মন্থর হতে পারে। কিন্তু স্তব্ধ হয়ে যায় না।

পদার্থবিদ্যা, তথা বিজ্ঞানের সর্বত্র, প্রতিটি পরীক্ষণের পেছনে একটা উদ্দেশ্য থাকে, থাকে দর্শন। পদার্থ বিদ্যার ক্ষেত্রে একটা উদাহরণ দিলে কথাটা পরিষ্কার হবে। একটি শিশুও জানে যে আলো ছাড়া আমরা কিছুই দেখতে পাইনা। একটা অন্ধকার ঘরে কোনও বস্তু দৃশ্যমান করতে হলে আলো জ্বালতে হয়। আলো জ্বালালে কি হয়? আলোর উৎস থেকে আলোক তরংগ ঐ বস্তুতে পড়ে বিচ্ছুরিত হয়। তা দর্শকের চোখে এলে-যে প্রক্রিয়া হয় তাকেই বলা হয় দেখা। বস্তুটির আকার যত ছোট হতে থাকবে আলোক তরংগদৈর্ঘ্য তত ছোট নেওয়া প্রয়োজন। যেমন, একটি কেলাস 'দেখতে' হলে, অর্থাৎ এর অভ্যন্তরীণ গঠন জানতে হলে 'দৃশ্যমান' আলোক বা অতিবেগুনি রশ্মি ব্যবহার করলে চলবে না। সেখানে প্রয়োজন রঞ্জন রশ্মির। বস্তু ক্রমশঃ আরও ছোট হতে থাকলে তখন পদার্থ বিদ্যার বিখ্যাত 'অনিশ্চয়তা সূত্র' প্রযোজ্য হবে। তখন বস্তু–কণা, কণা–বস্তু একাকার। অর্থাৎ একই সাথে পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত দুটি রাশি, যেমন বস্তু কণিকার অবস্থান ও ভরবেগ, পরিমাপে সহজাত (inherent) ত্রুটি থাকবে। অন্য কথায়, আমাদের দৃশ্যমান জগতের ধ্যান–ধারণা মাইক্রোস্কোপিক জগতে ব্যবহার করা যাবে না। পদার্থ বিদ্যার নিয়মের কথা কিন্তু বলছিনা। এখানে যে দর্শন কাজ করছে তা হচ্ছে যা 'পর্যবেক্ষণ' করতে চাই, তার জন্য এমন `Probe' বেছে নিতে হবে যার সাথে ঐ বস্তুর পারস্পরিক ক্রিয়া থাকে। কোনও অতিক্ষুদ্র বস্তুর গঠন অনুসন্ধান করতে রঞ্জন রশ্মি এবং নিউট্রন ব্যবহার করা হয়। রঞ্জন রশ্মি 'দেখছে' কোথায় কোথায় ইলেকট্রন রয়েছে, অর্থাৎ ইলেকট্রন 'ঘনত্ব' পর্যালোচনা করছে, অন্য কথায় ভারী পরমাণুর অবস্থান নির্দেশ করছে। আর নিউট্রনের বিচ্ছুরণের প্রস্থচ্ছেদ (scattering cross section) প্রোটন থেকেই সর্বাধিক বলে ঐ বস্তুকণিকার কোথায় কোথায় হাইড্রোজেন অণু রয়েছে তা পরীক্ষা করছে নিউট্রন।

অনু বা পরমাণুর গঠন, প্রকৃতি, তাদের গতি–স্থিতি ইত্যাদি যাবতীয় ধর্ম জানার জন্য একই `Probe' (বিভিন্ন অবস্থায়) এবং ভিন্ন ভিন্ন `Probe' নিয়ে কাজ করা হয়। পরমাণুর কেন্দ্রে অবস্থিত নিউক্লিয়াসের গঠন ইত্যাদি এবং তদভ্যন্তরীণ নিউক্লিওনের গঠন ইত্যাদিসহ বিভিন্ন তথ্য জানার জন্য বিভিন্ন প্রকার `Probe' নেওয়া হয়। এগুলো সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করার পদ্ধতিগত সুস্পষ্ট দর্শন রয়েছে। পদার্থ বিজ্ঞানী মাত্রই তা জানেন। বিভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থাকে, থাকে তন্ন তন্ন করে প্রকৃতিকে জানার

কতনা প্রয়াস। থাকে অজানাকে জানার আগ্রহ, আনন্দ। নতুন নতুন তথ্য জন্ম দেয় নতুন নতুন তত্ত্বের। প্রকৃতির অবগুন্ঠন খোলার প্রয়াস পদার্থ বিজ্ঞানের। তাই পদার্থ বিদ্যাকে যথার্থই অভিহিত করা হয়েছে Philosophy of Nature বলে।

দর্শনের এ শাখাটি (কিংবা বিজ্ঞানের এ শাখাটি) `exact Science'। যা কিছু বলা হয় সবই পরিমাপযোগ্য। প্রতিটি পরিমাপে 'ত্রুটি' (error) বলে দিতে হয় যে কোনও পরীক্ষাণে। একাধিক তাত্ত্বিক হিসাব থেকে লব্ধ ফলের সাথে ঐ ত্রুটি সীমারমধ্যে পরীক্ষণ লব্ধ মানের তুলনা বলে দেবে কোন তত্ত্বটি অন্য তত্ত্ব থেকে উন্নত। ঐ বিশেষ তত্ত্বটিকে একই পদার্থের অন্যান্য ধর্মের সাথে যাচাই করে তবে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। অন্যথায় সবগুলো তথাকথিত 'তত্ত্ব' এক একটি 'মডেল' মাত্র। এসব মডেলের স্বীকার্যের মধ্যে কখনও কখনও আকাশ–পাতাল পার্থক্য থাকতে পারে। পদার্থ বিদ্যার ভান্ডার, তাই বলছিলাম, এত বিশাল যে এদের সহ অবস্থান সেখানে অগ্রহণযোগ্য নয়। অন্য কথায় ঐ ঐ বস্তুর সম্পর্কে পদার্থ বিজ্ঞানীর জ্ঞান সীমাবদ্ধ কিংবা কূটভাবে বলে ত্রুটিপূর্ণ। আশৈশব পদার্থ বিদ্যা এভাবে এগিয়েছে অনেক অনেক ক্ষেত্রে। নিউক্লিয় পদার্থ বিদ্যা তারই একটি উদাহরণ। জ্ঞান–সমূহের তীরে নিতান্ত ভাগ্যবান ব্যক্তিগণই নুড়ি–পাথর কুড়ান। অধিকাংশ ব্যক্তিই দিগ্‌দর্শনের অভাবে সত্যকে হাতড়ে বেড়ান 'সেই অন্ধকার প্রকোষ্ঠ ···' খোঁজার উদ্দেশ্যে। তাঁদের জীবন কাটে শ্রীকান্তের মত। প্রতিনিয়ত তাঁরা যাকে কেন্দ্র করে ঘুরছেন, না পারছেন তার কাছে আসতে, না পারেন তার থেকে দূরে সরে যেতে। তবুও `Philosophy of Nature' মাবন–সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই আকর্ষণ করে চলেছে অগণিত জ্ঞান–পিপাসুকে। আর এ ফলশ্রুতি স্বনামধন্য বিজ্ঞানী আবদুস সালামের ভাষায়- ``Physics is an incredibly rich discipline"

যে কয়টি বিষয় নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় পদার্থ বিদ্যা তাদের অন্যতম। এই সাত দশকে বিশ্বে পদার্থবিদ্যা বিস্তৃতি লাভ করেছে সাত সাগরের সীমানা ছাড়িয়ে। দিগন্ত প্রসারী এ অগ্রগতির ফলে মানব–সভ্যতায় পদার্থ বিদ্যার অবদান অসামান্য। জ্ঞান–বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাকেও টেনে নিয়ে গেছে দুর্দাম গতিতে। ফল স্বরূপ, বিজ্ঞানের নতুন নতুন শাখার উৎপত্তি হয়েছে। এক জোড়া নিকল প্রিজম আর বর্ণালী বিশ্লেষক যন্ত্রের উপর নির্ভর করে গবেষণার দিন আর নেই। একটি তেজস্ক্রিয় রশ্মির উৎস আর প্রতিপ্রভ পর্দা (fluorescent screen) নিয়ে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে চরম ধৈর্যের সাথে আলফা কণিকা গণনা করার দিনও আজ শেষ। বর্তমান শতাব্দীর পদার্থ বিদ্যার গোড়া পত্তনে এ ধরনের পরীক্ষণ যে কি অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছে, সো কথা পদার্থবিদ্যার ছাত্র–ছাত্রীরা অবগত আছেন।

পদার্থ বিদ্যা মানব–সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এমন শাখা আছে কি যেখানে প্রত্যক্ষভাবে পদার্থ বিদ্যার প্রভাব পড়েনি? মানব–সভ্যতার এমন অংগ আছে কি যেখানে পদার্থ বিদ্যার স্পর্শ লাগেনি? এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে পদার্থ বিদ্যার চর্চার বিষয়টি পাঠক সমক্ষে উপস্থাপন করতে চাচ্ছি।

প্রাক্ ১৯৪৭ যুগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথা বাংলাদেশের তৎকালীন ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উল্লেখযোগ্য গবেষণার মধ্যে সন্দেহাতীতভাবে বসু–আইনস্টাইন সংখ্যায়ন অন্যতম। বিশ্ববরেণ্য পদার্থ বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্র নাথ বসু তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাঁর এ গবেষণা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথা বাংলাদেশের জন্য গৌরব বয়ে এনেছে। উপমহাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণাগার থেকে একমাত্র 'রমন প্রক্রিয়া' ছাড়া বিজ্ঞানে এমন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়নি। ইতিমধ্যে পদ্মা–মেঘনা–যমুনা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। বাংলাদেশ ঔপনিবেশিক শাসনমুক্ত। স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, তাও দু' দশক হয়ে গেল। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু আলোচনায় নিম্নলিখিত দু'টি প্রশ্নের জবাব খুঁজতে হবেঃ

১. সামর্থ্য ও মেধানুসারে আমরা কি বাংলাদেশে পদার্থবিদ্যা তথা সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞানোন্নয়নে সক্ষম হয়েছি?

২. বাংলাদেশে পদার্থ বিদ্যার বা বিজ্ঞান চর্চার বর্তমান অবস্থায় কি আমরা আত্মতৃপ্ত?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতে কিছুমাত্র চিন্তা করতে হয়না। উত্তর সন্দেহাতীতভাবে 'না'। বিশ্বের উন্নত দেশসমুহের সাথে তুলনা করা অর্থহীন। প্রতিবেশি রাষ্ট্র ভারতের সাথেও তুলনা করতে সংকোচ লাগে। তবে, একই সাথে এ কথাও বলা প্রয়োজন যে, স্বাধীনতার লগ্নে ভারতের বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটা কাঠামো ছিল। আমাদের ছিল না। ঐ কাঠামোর উপর ভিত্তি করে গত ৪০–৪৫ বছরে ভারতে পদার্থ বিদ্যার ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ। তবে এ কাঠামোই একমাত্র কারণ হতে পারে না। পদার্থ বিদ্যার ক্ষেত্র বিবেচনা করে ভারতকে উন্নয়নশীল দেশ বলা যাবে না, বরং একটা উন্নত দেশ এবং প্রথম সারির দেশ বললে বোধকরি অত্যুক্তি হবে না। আর আমাদের সাথে এ ক্ষেত্রে সে দেশের ব্যবধান ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। একটা উদাহরণ দিয়ে কথাটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করছি। কোলকাতার উপকণ্ঠে একটা পরিবর্তনক্ষম শক্তির সাইক্লোট্রোন (variable energy cyclotron) বসিয়েছেন সে দেশের বিজ্ঞানী–প্রকৌশলীরা। এ সাইক্লোট্রোনের নাট–বল্টু থেকে শুরু করে যাবতীয় যন্ত্রাংশ সে দেশে তৈরি। এ সাইক্লোট্রোনের সাহায্যে এবং একে ঘিরে উন্নতমানের বিভিন্ন মৌলিক এবং ফলিত গবেষণা চলছে। ফলে কেবলমাত্র নিউক্লিয় পদার্থ বিদ্যায়ই নয়, পদার্থ বিদ্যার অন্যান্য শাখাসহ বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে অগ্রগতি হচ্ছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, সর্বাত্মক মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার বছর দুই আগে বাংলাদেশের পদার্থ বিজ্ঞানীরাও এ ধরনের একটা সাইক্লোট্রোন স্থাপনের পরিকল্পনা করছিলেন। এটা কিন্তু ভারতীয় সাইক্লোট্রোন বসানোর সংবাদ জানার আগের কথা। এ ধরনের ত্বরক যন্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম – এ কথা বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদের অজানা ছিল না– এ কথাটাই বোঝাতে চাচ্ছি। মেধার দিক থেকে বাংলাদেশ এ উপমহাদেশের কোনও অঞ্চল থেকে পেছনে নয়। পেছনে থাকার কারণই নেই।

বাংলাদেশের নবীন ও প্রবীণ পদার্থ বিজ্ঞানীরা বিদেশে (বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে) যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। কিন্তু সামর্থ্য ও মেধানুসারে বাঙালী পদার্থ বিজ্ঞানীরা নিজ দেশে পদার্থ বিজ্ঞানের উন্নয়নে সমর্থ হননি। এ ব্যর্থতা সকলের – বিশেষ কোনও গোষ্ঠীর আলাদা করে নয়। জ্ঞান–বিজ্ঞানের কোথাও জোড়াতালি চলে না। দীর্ঘ মেয়াদী ত' নয়ই – তাৎক্ষণিকভাবেও নয়। জ্ঞানার্জনের কোনও `made easy' নেই। প্রতিটি ধাপ বেয়ে যেতে হবে অগ্রগতির লক্ষ্যে। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পদার্থবিদ্যা যে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে হয়তো সে কথা সে বোঝাতে সক্ষম হয়নি। কিংবা পরিকল্পনাবিদরা উন্নয়নে মৌলিক বিজ্ঞান চর্চার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে সক্ষম হননি। অথবা কার্যকর যৌথ উদ্যোগের অভাব হয়েছে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা পরে করছি।

এবার পরবর্তী প্রশ্নে আসা যাক্। বাংলাদেশের বিজ্ঞান চর্চা – বিশেষ করে পদার্থ বিদ্যার বর্তমান অবস্থায় আমরা যে খুশী নই, উপরোক্ত বক্তব্য থেকে তা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। এ প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন সামনে রেখে আলোচনায় এগিয়ে যাই। বিগত বিশ বছরের কর্মকান্ড কিংবা গত চার দশকের কর্মকান্ড থেকে আমরা বাংলাদেশে পদার্থ বিদ্যার উন্নতির ব্যাপারে কি আশাবাদী? উত্তরে সরাসরি 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' না বলে বলা উচিত 'আমরা আশাবাদী হতে চাই।' পদার্থ বিদ্যার উন্নয়ন দেশের সার্বিক অগ্রগতিতে দারুণভাবে সাহায্য করতে সক্ষম, এ কারণে। একটা পাত্রকে অর্ধশূন্য বা অর্ধপূর্ণ যা–ই বলা হউক না কেন আশা–নিরাশার চুল–চেরা হিসাব বাদ দিয়ে অর্থ একই। তাই বলছিলাম – আশাবাদী হতে চাই। বাঙালীর বুদ্ধিমত্তায় সন্দেহ নেই। অন্তত এ উপমহাদেশের কোনও অঞ্চলের অধিবাসীদের চাইতে আমরা কম মেধাবী নই। সুযোগ–সুবিধা, পরিবেশ–পারিপার্শ্বিকতা ইত্যাদি গড়ে তুলে সর্বোপরি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে পদার্থ বিদ্যার উন্নয়ন কিভাবে সম্ভব সে দিকটায় আসছি। বিজ্ঞান, বিশেষ করে পদার্থ বিজ্ঞান জন্ম দেয় প্রযুক্তির। তাই পদার্থ বিজ্ঞানের উন্নয়নে নিহিত আছে দেশের সার্বিক অগ্রগতি।

উচ্চ প্রযুক্তির (high technology) কথা ধরা যাক্। ইলেকট্রনিক্স, মাইক্রো প্রসেসর, কম্পিউটার, আধুনিক যোগাযোগ পদ্ধতি, মহাকাশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, লেজার প্রযুক্তি, চিকিৎসা প্রযুক্তি আজ মানব–সভ্যতার স্বর্ণদ্বার উদ্‌ঘাটন করেছে। এ তালিকায় আরও সংযোজন করা যায়। এ সবের মূলে রয়েছে পদার্থ বিদ্যা। নিউক্লিয় পদার্থ বিদ্যার কথা ধরা যাক। বিশ্বের জ্বালানী সমস্যা সমাধানে এর গুরুত্ব অপরিসীম। ফিশন এবং ফিউশন চুল্লী নিউক্লিয় পদার্থ বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ অবদান। এ প্রযুক্তি অর্জন করতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অসংখ্য পদার্থ বিজ্ঞানীকে একাগ্রচিত্তে অন্ততঃ পঞ্চাশ বছর ধরে নিউক্লিয় পদার্থ বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণা করতে হয়েছে। কৃষি, শিল্প, চিকিৎসাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার এ গবেষণারই ফসল। মূল কথা হচ্ছে, পদার্থ বিদ্যার চর্চা বিশ্বের উন্নত এবং অনুন্নত–এই উভয় দেশের জন্যই অতি প্রয়োজনীয়।

ÍPhysics is the science of wealth creation par excellence" – বলেছেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আবদুস সালাম।

পদার্থ বিজ্ঞানের দু'টি মূলধারা। একটি মৌলিক, আর অপরটি ফলিত। এ ধারা দু'টি কখনও অঙ্গীভূত হয়ে, কখনও বা সামান্য, আবার কখনও বা বিস্তর দূরত্ব বজায় রেখে এগিয়ে গেছে। অন্য কথায় বলতে গেলে, ফলিত গবেষণাই শুধু নয়, মৌলিক গবেষণাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণা বলতে সামঞ্জস্য বজায় রেখে এ দু' এলাকায়ই গবেষণা বুঝতে হবে। উন্নত দেশ থেকে প্রযুক্তি আমদানী করা যায় না। পোর্ট ফোলিও ব্যাগে করে দু'চারটে বই বা লেকচার নোট আনা যায় বটে, বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি বয়ে আনা যায় না। যাঁরা বলে থাকেন, একটা অনগ্রসর দেশ নিজ দেশের সমস্যা সামনে রেখেই গবেষণা করবে ফলিত বিষয়ে, আর মৌলিক গবেষণা হবে উন্নত দেশেই কেবল, তাঁদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করতে চাচ্ছি। তৃতীয় বিশ্বে বিজ্ঞানের উন্নয়নের লক্ষ্যে যারা চিন্তা–ভাবনা করেন, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আবদুস সালাম নিঃসন্দেহে তাঁদের অন্যতম। তাঁর ভাষায়–

> ``We have paid little heed to the scientific base of technology, i. e. to the truism that science transfer must always accompany technology transfer, if technology transfer is to take."

একটা গাছের চারা একস্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে গেলে সেটি বাঁচবে কিনা পূর্বেই ভেবে দেখা দরকার। প্রযুক্তি আমদানীও তেমনি। আলো–মাটি–বাতাসের সাথে খাপ খায় কিনা দেখতে হবে। দেখতে হবে যথার্থই বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রস্তুত রয়েছে কিনা। মৌলিক গবেষণাই সে ভিত্তি তৈরি করে। তাছাড়া মৌলিক গবেষণার সাথে জড়িত বিজ্ঞানীই জানবেন বিজ্ঞানের অগ্রগতির সংবাদ। নতুবা বিজ্ঞানের যে অগ্রগতি হয়েছে দেশ সেকথা জানতেই পারবেনা। বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে থাকতে হলে গ্রাহকের ভূমিকায় নয়, বিজ্ঞানের ভান্ডারে কিছু দান করা ও চাই। অর্থাৎ অংশীদারীত্ব চাই।

বহিঃশত্রুর মোকাবিলায় সীমান্তরক্ষীর ভূমিকা প্রধান, সন্দেহ নেই, কিন্তু যথেষ্ট নয়। এ সাথে প্রয়োজন সহায়ক শক্তি এবং সামগ্রিক জন সমর্থন। ক্ষুধা, দারিদ্র, রোগ ইত্যাদির মোকাবেলায় ও তেমনি। কৃষি শিল্প, চিকিৎসার উন্নয়নে প্রয়োজন সামগ্রিক পরিকল্পনা। বাংলাদেশে সম্ভবতঃ এ যাবৎ সঠিকভাবে কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। যা হয়েছে তা হ'ল মূলে না গিয়ে জোড়াতালি দেওয়া। এ পরিকল্পনার জন্য যেমন প্রয়োজন অর্থনীতিবিদ্‌সহ সমাজ বিজ্ঞানী, তেমনি চাই পদার্থ বিজ্ঞানী সহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিজ্ঞানীদের অংশগ্রহণ। এ যাবৎ একজন পদার্থ বিজ্ঞানীকেও নেওয়া হয়েছে বলে শুনিনি।

মেধার পাচার (Brain drain) একটি বহুল আলোচিত বিষয়। ব্যাপক অর্থে একে মেধার অপচয়ও বলা যায়। অন্যান্য উন্নয়নকামী দেশের মত এর হাত থেকে বাংলাদেশও রক্ষা পায়নি। এটি একটি বিরাট সমস্যা। একটি ছেলেকে বা মেয়েকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষিত করে তুলতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয় দেশের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা ধরলে দেখা যায়, মোটামুটি ২৫ হাজার ছাত্র এবং বার্ষিক বাজেট মোটামুটি ৪৫ কোটি টাকা। আবাসিক হলে থাকতে তার নিজস্ব খরচ এ বাজেটে ধরা হয়নি। এসব বিবেচনা করে ঐ ছেলে-মেয়েকে চিন্তা করতে হবে তার দেশকে, তার মাতৃভূমি বাংলাদেশকে কিছু দিতে এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নে সাধ্যমত অবদান রাখতে সচেষ্ট হতে। আমেরিকা পাড়ি দেওয়া জ্ঞানার্জনের জন্য প্রয়োজনীয় নিঃসন্দেহে। এ সাথে এটাও নিঃসন্দেহে সত্য যে তাঁকে দেশে ফিরে এসে দেশ সেবা করতে হবে- এটা আশা করতে পারে তাঁর নিজের দেশ। বিজ্ঞানের সেবাই হবে তার দেশ সেবা। এ হচ্ছে সামগ্রিক চিত্রের এক দিক।

অন্যদিকও আছে। অজানাকে জানার আগ্রহ শিশু থেকে আরম্ভ করে সকলেরই মধ্যে রয়েছে। উন্নত দেশের উন্নতমানের গবেষণাগারের সুযোগ-সুবিধার একটা অংশও তাঁর জন্য দেশে থাকার দরকার। সুপার-সনিক যুগে গোযান দিয়ে প্রতিযোগিতা করা চলে না। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বিদেশ পাড়ি দেওয়া পদার্থ বিজ্ঞানীর একমাত্র কাম্য নয়। দেশে পর্যাপ্ত না হোক্ মোটামুটি ভালো গবেষণাগার থাকা দরকার। অন্যথায় একজন জ্ঞান-পিপাসুকে অনুন্নত নিজ দেশে ধরে রাখা যাবে না। তাই মেধার পাচার আমাদের দেশসহ উন্নয়নকামী সকল দেশেরই বড় সমস্যা।

পদার্থ বিজ্ঞানে ক্রান্তি (critical) বলে শব্দটি বহুল ব্যবহৃত। সে সূত্র ধরে বলা যায় একটা গবেষণাগার উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে `critical size' অর্জন করলেই। নতুবা দু'চারজন বিজ্ঞানী ভালো গবেষণা করলেও তাঁদের কাজের প্রভাব তেমন পড়েনা। এর বহু উদাহরণ রয়েছে এবং তাই আর্থিক সীমাবদ্ধতার কথা মনে রেখে প্রধানমত যে কাজটি হওয়া উচিৎ তা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগার সমূহে ব্যয় বহুল গবেষণার পুনরাবৃত্তি না করা। যেমন, সরকার কেন্দ্রীয়ভাবে নিউক্লিয় পদার্থ বিদ্যার একটা গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। দেশের বিভিন্নস্থানের বিজ্ঞানীরা সেখানে গবেষণার সুযোগ পাবেন এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে মানোন্নয়নে সমর্থ হবেন। ঢাকার অদূরে সাভারে পরমাণু শক্তি কমিশনের যে গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে সেখানে মৌলিক এবং ফলিত গবেষণার মূল উৎস রি-এ্যাক্টর (Reactor) এবং একটি নিউট্রন উৎপাদক যন্ত্র (Neutron generator)। সেখানে কিংবা অন্য কোনও সুবিধাজনক স্থানে এটা হতে পারে। এমনি ধরনের কিছু গবেষণাগার স্থাপনে উদ্যোগী হতে সরকারকে অনুরোধ করা যায়। এগুলো ঘিরে সামঞ্জস্য পূর্ণ এবং `goal oriented' গবেষণা হবে। এসব কেন্দ্রে অনেক ছেলে-মেয়েরা উচ্চতর ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে কাজ করবে। একথা সর্বজন বিদিত যে, গবেষণাগারের সার্বিক মানোন্নয়নে পিএইচডি গবেষকদের অবদান প্রচুর। এভাবে

গবেষকদের টিম গড়ে ওঠে এবং `critical size' লাভ করে গবেষণায়। সে ক্ষেত্রে পিএইচডি ডিগ্রীর উদ্দেশ্যে সাধারণভাবে বিদেশে পাঠানো নিরুৎসাহিত করা যায়, যেটা ভারত বেশ অনেকদিন থেকে করছে। অবশ্য অধিক `Interaction' এর জন্য 'পোস্ট-ডক্' গবেষণার উদ্দেশ্যে উন্নত দেশে যাওয়া প্রয়োজন। আর যে সব নতুন নতুন শাখা দেশে গবেষণার জন্য খুলতে চাচ্ছি সে সব শাখায় উচ্চতর ডিগ্রীর জন্য পাঠানো দরকার। আমাদের ধারণা এ ভাবে অগ্রসর হলে মেধার অপচয় কমে যাবে। তবুও বেশ কিছু নবীন বিজ্ঞানী বাইরে যেতে চাইবেন এবং যেতেও থাকবেন। তবে এদের সংখ্যা বর্তমান সংখ্যার চাইতে বহুলাংশে কমে যাবে। আর, সবাইকে দেশে আটকে রাখা কোনও কালেই সম্ভব নয়। নিজের দেশের কথা বিবেচনা করে এ সংখ্যা কমে যাবে, এ আশা পোষণ করে সে কথাই বলছিলাম।

এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয়ভাবে বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাবলী, বিশেষ করে বিদেশী গবেষণামূলক জার্নাল রাখার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে লাইব্রেরী স্থাপনের বিষয়টিও সরকার বিবেচনা করে দেখতে পারেন। বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা-প্রবন্ধের শিরোনাম (রচয়িতা এবং ল্যাব সহ) জানিয়ে মাসিক বুলেটিন প্রকাশ করে প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণাগারে পাঠানোর কাজটিও সহজেই করা সম্ভব। প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী কিংবা এই মুহূর্তেই বর্তমানের BANSDOC (Bangladesh National Scientific and Technical Documentation Centre) এ কাজটি করার দায়িত্ব নিতে পারে। হয়তো বা BANSDOC কে প্রস্তাবিত পূর্নাঙ্গ লাইব্রেরীতে পরিবর্তিত করা যায়। এটা অবশ্য বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষ।

এসব সুযোগ সৃষ্টি করে বিশ্ববিদ্যালয়সহ সমস্ত গবেষণাগারের বিজ্ঞানীদের জবাবদিহি'র ব্যবস্থা অবশ্যই থাকতে হবে। `Critical size' এর আগে কোনও 'জবাবদিহি' তেমন অর্থবহ হবে না, কারণ হিসেবে আগেই বলা হয়েছে `goal oriented' গবেষণাই অর্থপূর্ণ। `Publish mJ perish' নীতি আপনা থেকেই তখন এসে যাবে।

এবার অন্য একটি দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় ক'টি ছাড়াও কিছুসংখ্যক কলেজে স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে পড়াশুনা করা হয়। এদের মধ্রে কিছু সংখ্যক কলেজে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পাঠদান হয়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এগুলোর মান সম্পর্কে সন্দেহ থেকে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ স্থাপনের (প্রকৃতপক্ষে একটি কলেজও স্থাপন করা হয়নি, নাম পরিবর্তন করা হয়েছে মাত্র) প্রধান উদ্দেশ্য ছিল উচ্চতর জ্ঞানার্জনের সুযোগ বৃদ্ধি করা। পদার্থ বিদ্যার কথায় আসি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে জড়িত ছয়টি কলেজে পদার্থ বিদ্যায় স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে পড়ানো হয়। ইতিমধ্যে একটি ছাড়া বাকী পাঁচটিতে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ক্লাশ শুরু হয়েছে। এ যাবৎ এ ছয়টি কলেজ থেকে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারত। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি এবং কলেজসমূহে এ সংখ্যা ততোধিক বৃদ্ধি হওয়ার ফলে সংগত কারণেই এরা আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (পদার্থ বিদ্যা

বিভাগে) অংগনে আসতে পারছে না। এটা দুর্ভাগ্যজনক। পদার্থ বিদ্যার কথা বলছি। এর ফলে ভাগ্যাহত এই সব ছাত্র–ছাত্রীর কলেজগুলোতেই স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভর্তি হতে হচ্ছে, সব ক্ষেত্রে কিনা জানিনা, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। উপযুক্ত শিক্ষকের স্বল্পতা, যন্ত্রপাতির দৈন্য এবং লাইব্রেরীর সীমাবদ্ধতা– সব মিলিয়ে এক অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এ সমস্যার সমাধান হচ্ছে আরও অধিক সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা– `affiliated' বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা তথাকথিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় নয়। বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনার দাবী রাখে। এ সম্পর্কে এখানে আদৌ আলোচনায় যাচ্ছি না। দেশের জনসংখ্যার ভিত্তিতে গবেষণাধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ আরও বেশ কতগুলো বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া উচিত। অনুৎপাদন খাত থেকে এনে অর্থ জোগান করা যেতে পারে। 'শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড' এটি কথার কথা না হয়ে কাজে লাগানো প্রয়োজন। যতদিন পর্যন্ত নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত না হচ্ছে, ততদিন স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে পাঠদানকারী সব ক'টি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে স্নাতকোত্তর শ্রেণী চালু না করে কয়েকটিতে পদার্থ বিদ্যা, অন্য কয়েকটিতে রসায়ন – এভাবে বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হতে পারে। কি হবে, সেটা সার্বিক পরিকল্পনার ব্যাপার এবং সে দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে সরকারের (কলেজগুলো সরকারীও বটে)। বর্তমান প্রবন্ধে সাময়িক সমাধানের কথা–ই বলছিলাম। সরকারী কলেজের পদার্থ বিদ্যার সেরা জনশক্তি দু'তিনটা কলেজে জড়ো করা এবং তাঁদের গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার ক্ষেত্রেও অনুরূপ বক্তব্য উপস্থাপিত করা যায়। এ কথা সর্বজন বিদিত যে, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে জ্ঞানদান এবং জ্ঞানার্জন একই সাথে চলে। বলা বাহুল্য, গবেষণা ভিন্ন সে জ্ঞানার্জন আদৌ সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় গবেষণাগার–লাইব্রেরী স্থাপনের প্রস্তাবটি এ ব্যাপারে সাহায্য করতে সক্ষম হবে। প্রয়োজনীয় যোগ্য শিক্ষক, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং উপযুক্ত লাইব্রেরীর ব্যবস্থা না করে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ প্রকৃতপক্ষে 'কাগুজে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ' ছাড়া আর কিছু নয়। উন্নত বা উন্নয়নশীল যে কোনও একটি দেশের বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের কথা মনে রেখে কথাটি বলা হল।

পরিশেষে দেশের আর্থ–সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে নিজেকেই কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি। চার দেওয়ালের মধ্যে অর্থাৎ শ্রেণী কক্ষে একজন শিক্ষার্থীকে ধরে রাখতে চাচ্ছি। এ জন্য পদার্থ বিদ্যার পাঠ্য বিষয় আনন্দদায়ক করতে পেরেছি কি? মেধা খাটানোর ব্যবস্থা এতে আছে কি? পদার্থ বিদ্যার ক্রমবর্ধমান সীমারেখা তাকে আকর্ষণ করছে, না কি মরীচিকার মত মিলিয়ে যাচ্ছে? ক্ষীণ হলেও কোথাও কি আশার আলো দেখা যাচ্ছে? দেশের গন্ডীর মধ্যে তাকে ধরে রাখার বিষয়টিও একই আঙ্গিকে বিবেচনায় আনতে হবে। তার আগামী দিনগুলো পদার্থ বিদ্যাকে ঘিরে হবে। এ স্বপ্ন দেখা তার পক্ষে স্বাভাবিক। পদার্থ বিদ্যার প্রশিক্ষণ জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও যদি তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে, সেটাও হবে পদার্থ বিদ্যা চর্চার সাফল্য – অবশ্য অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে সেটা। যে গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করার কথা বার বার বলছি, সেখানে রীতিমত বহু

ছেলে মেয়ের গবেষণা–চাকুরীর ব্যবস্থা হবে। যত তাড়াতাড়ি এর প্রতিষ্ঠা হয় ততই মংগল।

উন্নত ও উন্নয়নকামী দেশ সম্পর্কে আবদুস সালামের উক্তি–

"Science and Technology are what distinguish the South from the North. On Science and Technology depend the standards of living of a nation. The widening gap in Economics and in Influence between the nations of the South and the North is basically the Science gap."

এককথায় এর অর্থ হচ্ছে– বিজ্ঞানে উন্নত দেশসমূহ অনুন্নত দেশসমূহকে পেছনে রেখে অতি দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। ÈIndian Association for the Cultivation of Science' এর প্রতিষ্ঠার্থে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের বক্তব্য স্মরণ করে আলোচনা শেষ করছি–

``We are so constituted that we must either go forward or be driven backward; we cannot remain stationary. There is an immense difference beteen the civilized man and the man happening to live in civilized times. Such incidents of birth will never endow us with the privileges of the times in which we live unless we render onrselves worthy of the same."

১৮৭১ সনের কথাগুলি আজও সত্যি। আলফ্রেড নর্থ হোয়াইটহেডের উদ্ধৃতিতে এ কথার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। কথাগুলি হচ্ছে–

``In the conditions of modern life, the rule is absolute; the race which does not value trained intelligence is doomed . . . . Today we maintain ourselves, tomorrow science will have moved over yet one more step and there will be no appeal from the judgement which will be pronounced . . . . on the uneducated."

তাই বলছিলাম ডাঃ সরকারের কথাগুলি আজ আরও অধিক সত্যি, কারণ বর্তমান যুগ উচ্চ প্রযুক্তির। পদার্থ বিদ্যা এই উচ্চ প্রযুক্তির জন্মদাতা, এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না। দেশের সার্বিক অগ্রগতির লক্ষ্যে পদার্থ বিদ্যার চর্চা তাই অতি গুরুত্বপূর্ণ সোপান। এ সত্য যত শিগ্‌গির আমরা অনুধাবন করি, ততই মঙ্গল।